বেগম রোকেয়া

ভবেশ মৈত্র

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

প্রাক্ কথন

ডা. নরম্যান বেথুনের জীবনী গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছিলেন সুন চিংলিং (মাদাম সান ইয়াৎ সেন)। তাতে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'সবযুগেই মানুষের সামনে প্রতিপক্ষরূপে দেখা দেয় তার কালের বিশিষ্ট কতগুলি কর্তব্যের আহ্বান। যিনি অমিত নিষ্ঠা, সংকল্প, সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে তাতে সাড়া দিতে পারেন তিনি সে যুগের বীর ও সারথি।' রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এইভাবে একটি 'কর্তব্যের আহ্বানে' সাড়া দিয়েই নিষ্ঠা, সংকল্প, সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে বাংলার মুসলিম নারী সমাজের উন্নয়নে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। কবি গোলাম মোস্তাফা তাঁর উদ্দেশে লিখেছেন —

নিষেধের শত বাধা বন্ধন, সেথা নেই কেহ সাথী
তবু সেই পথে হইলে বাহির, ওগো দুঃসাহসিকা।

সমাজ সংস্কার এবং বিশেষ করে নারী মুক্তির জন্য তাঁর

প্রচেষ্টা অতুলনীয়। সেই সময়ে অন্য কোনো মুসলমান মহিলাকে এই ধরনের দৃপ্ত পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। তিনি তাই অনেকেরই প্রেরণার উৎস।

বেগম রোকেয়া খাতুন জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করার আগে সেই সময়টাকে ধরার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

সূচিপত্র

মুঘল শাসনকালের শেষ দুই দশক	১১
পলাশি যুদ্ধের পর	১৮
রোকেয়ার জন্ম ও শৈশব	২৫
সমসাময়িক হিন্দু সমাজের অবস্থা	২৯
রোকেয়ার বাল্যে পর্দাপ্রথা	৩৪
নতুন ভাবনার উন্মেষ ও তার সীমাবদ্ধতা	৩৬
মাতৃভাষা কি কখনও ভোলা যায়?	৩৯
প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে নারীশিক্ষা ও রোকেয়ার সাধনার সূচনা পর্ব	৪২
বিবাহসূত্রে রংপুর থেকে ভাগলপুর	৪৪
ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায়	৪৮
বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের সামাজিক তাৎপর্য	৫০
নারীর স্বাধীনতা ও পুরুষের সমকক্ষতা প্রসঙ্গে	৫৪
সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়	৫৬
সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নারী সংগঠন	৬২

অবরোধ প্রথা ও মুসলিম নারীসমাজ	৬৫
স্বদেশপ্রেমিক রোকেয়া	৬৮
রোকেয়ার সাহিত্যকৃতি	৭০
শেষজীবন	৭৩
পরিশিষ্ট — ১	৭৬
পরিশিষ্ট — ২	৭৮
পরিশিষ্ট — ৩	৮৪
পরিশিষ্ট — ৪	৮৫
পরিশিষ্ট — ৫	৯৬
পরিশিষ্ট — ৬	৯৮
পরিশিষ্ট — ৭	১০১
পরিশিষ্ট — ৮	১২৭
পরিশিষ্ট — ৯	১২৯
Appendix – 10	১৩৫
Appendix – 11	১৪৩
Appendix – 12	১৪৬

মুঘল শাসনকালের শেষ দুই দশক

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৭৫৭ সালের গুরুত্ব সকলেরই জানা। এই পটপরিবর্তনের পশ্চাদপটটা সংক্ষেপে একটু আলোচনা করলে বিষয়ে প্রবেশ করা সহজতর হতে পারে। সাধারণভাবে সকলেরই জানা যে মুসলমান শাসকদের গদিচ্যুত করে প্রথমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তী সময়ে মহারানি ভিক্টোরিয়ার হস্তক্ষেপে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। পলাশির যুদ্ধের এক শতাব্দী পরে সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা (১৮৫৭) ব্রিটিশ শাসকদের বিশেষভাবে আলোড়িত করে এবং একটি ঘোষণার মারফত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতবর্ষের শাসনভার ইংল্যান্ডেশ্বরী মহারানি ভিক্টোরিয়া নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লির মসনদে বসেন জাহান্দার শাহ (১৭১২) এবং ১৭১৩ সালে সম্রাট হন ফারুকশিয়ার। ১৭১৭ সালে ফারুকশিয়ার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলাদেশে নিঃশুল্ক বাণিজ্য করবার অনুমতি দেন।

কোম্পানির আধিপত্যের এইটাই সূচনা। ১৭১৯ সালে ফারুকশিয়ার নিহত হন এবং মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। দিল্লিতে তখন টালমাটাল অবস্থা চলছে। চলছে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই।

১৭০০ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। তারপর ১৭০৭ সালে নায়েব সুবাদার, এবং ১৭১৭ সালে তিনি সুবে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। সে সময়ে নির্দিষ্ট নজরানার বিনিময়ে দেওয়ান ও সুবাদাররা বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। মুর্শিদকুলি খাঁ-র মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সরফ্‌রাজ খান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৪০ সালে নবাব সরফ্‌রাজ খাঁ-কে হত্যা করে আলিবর্দি খান বাংলার মসনদ দখল করেন। সে সময়ে দিল্লির শাসন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়ে। ১৭২৪ সালে দক্ষিণ ভারতে নিজামশাহি স্থাপিত হয় এবং এ বছরেই অযোধ্যার রাজা মুঘল সম্রাটের প্রাপ্য নজরানা দিতে অস্বীকার করে কার্যত স্বশাসন প্রতিষ্ঠান করেন। বাংলার স্বঘোষিত নবাব আলিবর্দিও নজরানা দেওয়া বন্ধ করে দেন। ফলে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সতেরো বছরের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে মুঘলশাসন বলে আর কিছুই রইল না।

মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে এনে যে নতুন শহর স্থাপন করেন সে শহর আজও মুরশিদাবাদ বলে খ্যাত। মুর্শিদকুলি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি একাই ছিলেন নবাব, সুবাদার ও দেওয়ান। সুবাদারের অধীন ছিল ফৌজদার ও জমিদার। আমিল, কানুনগো এবং জমিদারদের সহযোগিতার ভিত্তিতে তখন শাসন পরিচালিত হত। তবে সে সময় ভাগিরথীর পশ্চিমপারে মারাঠি দস্যু (বর্গী)রা প্রায় প্রতিবছরই লুঠতরাজ করতে আসত।

নদীমাতৃক দেশে জমি উর্বর থাকায় সহজেই ফসল ফলত। জমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর খাজনা নির্ধারিত হত। রেশম,

এন্ডি ও তসর এবং সুতি ও রেশমবস্ত্র উৎপাদনে বাংলা খুবই উন্নত ছিল। সে সময়ের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক এন কে সিন্‌হা বলেছেন, 'The Bengali was skillful but technically illequipped and the low price of labour stood in the way of the development of machinery.'

আলিবর্দির শাসনকালে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বর্গিদের দমন। বাংলাদেশের নবাব-জমিদারদের সৈন্যবাহিনীতে পারস্য, মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের অনেক মানুষ যোগ দিয়েছিল। তারা ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে যে বেশি টাকা দিত তার হয়ে যুদ্ধ করত। চাকুরির শর্ত ছাড়া এদের অন্য কোনো আনুগত্য ছিল না বললেই চলে।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাদেশের ষোলোজন বড়ো জমিদারদের হাতে ছশো পনেরোটি পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেন। এছাড়া একহাজার পঁয়তাল্লিশটি ছোটো ছোটো পরগনা ছোটো ছোটো জমিদার অথবা তালুকদারের হাতে অর্পণ করেন। বড়ো ও ছোটো জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশই ছিল বাঙালি হিন্দু এবং বাকিরা ছিল মুসলমান।

১২০০ সালে বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে নদিয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গিয়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। অবশেষে তিনি ১২০৬ সালে মারা যান।

সুলতানি আমলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকদের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে আসতে থাকে। এরা অধিকাংশই ছিল আফগানিস্তান ও তুরস্কের অধিবাসী। এদের সঙ্গে রক্ষণশীল ও উদারপন্থী উভয় সম্প্রদায়ের ইসলামপন্থীরা, বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারে আসেন। বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থানের যুগে

ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়া রাজ অনুগ্রহেরও প্রভাব ছিল। কাজি আবদুল ওদুদ তাঁর 'শাশ্বত ভারত' গ্রন্থে 'বাংলার মুসলমানের কথা' নিবন্ধে লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানের অতীত সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারা গিয়েছে তাতে বলা যায়, বহু উপাদানে এ-সমাজ গঠিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু উপাদান অর্থাৎ আদিম বাঙালী উপাদান, তাতে প্রচুর নিঃসন্দেহ, কিন্তু আরবী, পার্সী ও পাঠান উপাদানও নগণ্য ছিল না।... পারশিক যারা এদেশে এসেছিল তারা ছিল সংখ্যায় কম; সাধারণত রাজকর্মচারী। আর এসেছিল পাঠানরা — উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণীর। পাঠান জমিদার বংশ এখনও বাংলায় দুর্লভ নয়।

'বাংলার মুসলমানের অতীত বলতে একটা দীর্ঘকালের ব্যাপার বোঝায় — মুসলমানরা এদেশে যখন থেকে এসেছে, তখন থেকে ইংরেজ-শাসনের সূচনা পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, এই দীর্ঘকাল যে এদেশের মুসলমান সমাজ একই অবস্থার ভিতর দিয়ে কাটায়নি তা সহজেই অনুমেয়।'

ষোড়শ শতকের শেষদিক থেকে ভারতবর্ষে আসতে থাকে পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি ও ইংরেজ সওদাগরেরা। রাজকীয় সনদ নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তারা ব্যাবসা শুরু করে। প্রথমদিকে সোনার বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য তাদের দেশে নিয়ে যেত। এরা প্রধানত সমুদ্রপথেই ব্যাবসা-বাণিজ্য করত এবং নৌশক্তিতে বিশেষ শক্তিশালী ছিল। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকেরা নিজেদের মধ্যে সর্বদাই লড়াই মারামারি করত। এজন্য তারা তাদের সঙ্গে অস্ত্রধারী সৈন্যও রাখত। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যে কলহ বিবাদ দেখা দিলে, তার সঙ্গে এরাও জড়িয়ে পড়ত এবং তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করতে চেষ্টা করত। কালে এরা বিভিন্ন জায়গায় কুঠিও স্থাপন করে। এদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতাও চলত।

১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক তিনহাজার টাকার বিনিময়ে বাংলায় নিঃশুল্ক বাণিজ্য করার অনুমতি আদায় করে নেয়। কিন্তু এই সুযোগে কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাতে থাকায় আবার মুর্শিদকুলির সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অথবা কোম্পানির ব্রিটিশ কর্মচারীদের হয়ে বাঙালি বানিয়া, মুৎসুদ্দি ও মুনশিরা উৎপাদক ও কারিগরদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করত এবং এর মাধ্যমে তারাও প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। ব্যবসায়ে এই 'দস্তক'-এর অপব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করে ১৭৪০-এর পর থেকে, অর্থাৎ আলিবর্দির আমলে।

সুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলির অধীনে, ওড়িশার দায়িত্বে ছিলেন। মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর সুজাউদ্দিন বাংলার মসনদে বসেন (১৭২৭)। এই সময়ে মুঘল সম্রাটের নির্দেশে বাংলা, বিহার ও ওড়িশা একত্র সংযুক্ত হয়। সেই সময়ে আলিবর্দি খাঁ ছিলেন পাটনার দায়িত্বে। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফ্‌রাজ খান ১৭৩৯ সালে বাংলার নবাব হন। আলিবর্দির ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৪০ সালে নবাব সরফ্‌রাজ খান নিহত হন এবং আলিবর্দি খাঁ মসনদে বসেন।

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৭৫৭ সালের গুরুত্ব সকলেরই জানা। ঘটনাটা হঠাৎ ঘটে যায়নি। ১৭৫২ সালে আলিবর্দি খাঁ তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে সিরাজ-উদ্‌দৌলার নাম ঘোষণা করেন। ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল আলিবর্দি মারা যান। সিরাজ-উদ্‌দৌলা মসনদে আসীন হলে তা নবাবের অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন এবং মিরজাফরসহ দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মেনে নিতে পারেনি। তারা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সিরাজের বয়স তখন মাত্র একুশ বছর। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া